#আমি পদ্মজা পর্ব ৯

_____
আবুল জাহেদকে আহত অবস্থায় দেখে সবাই চমকে উঠল। কপাল বেয়ে তার রক্ত ঝরছে। একজন দৌড়ে গেল বাড়ির ভেতর ফার্স্ট এইড বক্স আনতে। লিখন কিছু সময়ের জন্য থমকাল। আবুল জাহেদের কপাল ব্যান্ডেজ করার পর তাকে একটা চেয়ারে বসতে দেয়া হলো। হেমলতা লাঠিতে এক হাতের ভর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। লিখন প্রশ্ন করল,' কী হয়েছিল? আপনি উনাকে আঘাত করলেন কেন?'

হেমলতা বললেন, ‘এই অসভ্য লোক আজ চারদিন ধরে মাঝরাতে এখানে ঘুরঘুর করে। তার উদ্দেশ্য খারাপ।’

লিখন আড়চোখে পদ্মজাকে দেখল। এরপর আবুল জাহেদকে প্রশ্ন করল, ‘ উনি যা বলছেন,সত্যি?’

আবুল জাহেদ গমগম করে উঠল, ‘আমি আজই প্রথম এসেছি এখানে। ঘুম আসছে না। তাই হাঁটতে হাঁটতে এদিক চলে এসেছি। হুট করেই উনি আক্রমণ করে বসলেন।’

হেমলতা প্রতিবাদ করেন দৃঢ় স্বরে, ‘ মিথ্যে বলবেন না একদম।’

আবুল জাহেদ কিছুতেই তার উদ্দেশ্য স্বীকার করল না। তর্কেতর্কে ভোরের আলো ফুটল। হেমলতা কঠিন করে জানিয়ে দিয়েছেন আজই এই বাড়ি ছাড়তে হবে। হেমলতার সিদ্ধান্ত শুনে দলটির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তীরে এসে নৌকা ডুবতে কীভাবে দেয়া যায়? সিনেমার শেষ অংশটুকু বাকি। শর্ত অনুযায়ী আরো দশদিন আছে। দলের একজন বয়স্ক অভিনেতা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হেমলতা জবাব দিলেন, ‘আমার তিনটা মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারবেন? একটা পুরুষ মানুষ রাতের আঁধারে যুবতী মেয়েদের

ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করবে কেন? কীসের ভিত্তিতে?’

হেমলতা সবাইকে এড়িয়ে লাহাড়ি ঘরে ঢুকেন। এদের সাথে তর্ক করে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। আবুল জাহেদের ধূর্ত চাহনি তার নজরে এসেছে বারংবার। প্রথম রাতে পায়ের আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি। এরপরদিন, সন্দেহ তালিকায় থাকা চার-পাঁচ জনকে অনুসরণ করে তিনি নিশ্চিত হোন, রাতে কে লাহাড়ি ঘরের পাশে হেঁটেছিল। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে তুষের স্তূপ। পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢাকা। অসাবধান বশে আবুল

জাহেদের কাঁদা মাখা জুতা তুষের স্তূপে পড়ে। ফলে জুতায় তুষ লেগে যায়। এরপরদিন হেমলতা বাড়ির বারান্দায় জুতাজোড়া দেখতে পান। তুষ বাড়ির আর কোথাও নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে তুষের স্তূপের কাছে এসে দেখেন, এক জোড়া জুতার চাপ। সেই জুতা যখন আবুল জাহেদ পরল তিনি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হোন।

শুটিং দলটার মধ্যে একটা হাহাকার লেগে গেল। বেশ কিছুকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলল। এরপর সবাই মোর্শেদকে ধরল। বিনিময়ে তারা আরো টাকা দিতে রাজি। হেমলতার

ধমকের ভারে তখন চুপ হয়ে গেলেও টাকার কথা শুনে মোর্শেদের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘরে এসে হেমলতার সাথে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। হেমলতা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ অবধি তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারলেন না। দলের কিছু ভাল মানুষের অনুরোধ ফেলতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দশদিনের বদলে পাঁচ দিনের সময় দেন। হেমলতা স্বস্থিতে নিঃশ্বাস ফেলেন। ভাগ্যিস কোনো ঘটনা ঘটার আগে ব্যাপারটা খোলাসা হয়েছে।

———————————

বেশ গরম পড়েছে আজ। মুন্নাকে পাশে নিয়ে পদ্মজা পাটিতে বসে আছে। মনোযোগ দিয়ে মুন্নাকে শিখাচ্ছে, কাকে কী ডাকতে হবে।

‘আমায় ডাকবি, বড় আপা। পূর্ণাকে ছোট আপা। আর প্রেমাতো তোর সমান। তাই প্রেমা ডাকবি। দুজন মিলেমিশে থাকবি। বুঝেছিস?’
‘হ, বুঝছি।’
‘আম্মাকে তুইও আম্মা ডাকবি। আমাদের আম্মা,আব্বা আজ থেকে তোরও আম্মা,আব্বা। বুঝছিস?’
মুন্না বিজ্ঞ স্বরে বলল, ‘হ, বুঝছি।’

হেমলতা রান্না রেখে উঠে আসেন। মুন্নাকে বলেন, ‘শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবি। তোর পদ্ম আপা যেভাবে বলে।’
‘কইয়ামনে।’
পদ্মজা বলল, ‘কইয়ামনে না। বল, আচ্ছা বলব।’
মুন্না বাধ্যের মতো হেসে বলে, ‘আচ্ছা, বলব।’
হেমলতা হেসে চলে যান। পূর্ণা রুম থেকে মুন্নাকে ডাকল,’মুন্নারে?’
‘হ,ছুড়ু আপা।’
পদ্মজা মুন্নার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল, ‘বল, জি ছোট আপা।’

মুন্না পদ্মজার মতো করেই বলল, ‘জি, ছোট আপা।’
পদ্মজা হাসল। পূর্ণা মৃদু হেসে বলল, ‘তোর নাম পাল্টাতে হবে। আমি তোর নতুন নাম রেখেছি।’
‘কেরে? নাম পাল্ডাইতাম কেরে?’
পদ্মজা কিছু বলার আগে মুন্না প্রশ্ন করল, ‘আইচ্ছা এই কথাডা কেমনে কইতাম?’

পদ্মজা হেসে কপাল চাপড়ে। এই ছেলে তো আঞ্চলিক ভাষায় বুঁদ হয়ে আছে। পূর্ণা বলল, ‘তুই এখন আমাদের ভাই। আমাদের নামের সাথে মিলিয়ে তোর নাম রাখা উচিত। কি উচিত না?’

মুন্না দাঁত কেলিয়ে হেসে সায় দিল, ‘হ।’
‘এজন্যই তোর নাম পাল্টাতে হবে। আজ থেকে তোর নাম প্রান্ত মোড়ল। সবাইকে বলবি এটা। মনে থাকবে?’
‘হ, মনে রাহাম।’
‘বল, আচ্ছা মনে রাখব।’
‘আচ্ছা, মনে রাখব।’

দুপুর গড়াতেই হাজেরা আসল। সাথে নিয়ে এসেছে বানোয়াট গল্প আর বিলাপ। ইশারা, ইঙ্গিতে সে লাউ চাইছে। মোর্শেদ গতকাল সব লাউ বাজারে তুলেছেন। গাছে আর একটা ছিল। ঘরে চিংড়ি মাছ আছে। প্রান্ত লাউ দিয়ে চিংড়ি খাবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ

করেছে।
হেমলতা হাসিমুখে শেষ লাউটা নিয়ে এসেছেন। এখন আবার হাজেরারও চাই। কেউ কিছু চাইলে হাতে থাকা সত্ত্বেও হেমলতা ফিরিয়ে দেননি। আজও দিলেন না। তিনি হাজেরাকে হাসিমুখে লাউ দিলেন। হাজেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলে গেল। পদ্মজা মায়ের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। প্রান্ত এই বাড়িতে এসে প্রথম যা চাইল তাই পেল না। মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তো! হেমলতা পদ্মজার দৃষ্টি বুঝেও কিছু বললেন না। প্রান্তকে ডেকে কোলে বসান। ছেলেটাকে দেখতে বেশ লাগছে। দুপুরে তিনি

গোসল করিয়েছেন। মনে হয়েছে কোনো ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করা হচ্ছে। জন্মদাতার মৃত্যু প্রান্তের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না। এজন্য কেউই অবাক হয়নি। বাপ-ছেলের শুধু রাতেই একসাথে থাকা হতো। অনেক রাত প্রান্ত একা থেকেছে। এইটুকু ছেলে কত রাত ভয় নিয়ে কাটিয়েছে!
হেমলতা আদুরে কণ্ঠে বললেন, ‘একটা গল্প শোনাই। শুনবি?’
‘হুনাও।’
পদ্মজা প্রান্তের ভাষার ভুল ধরিয়ে দিল, ‘হুনাও না। বল, শোনাও আম্মা।’
প্রান্ত মাথা কাত করে। এরপর হেমলতাকে বলল, ‘শোনাও আম্মা।’

আম্মা ডাকটা শুনে হেমলতা বুক বিশুদ্ধ ভাললাগায় ছেয়ে গেল। তিনি কণ্ঠে ভালবাসা ঢেলে বললেন, ‘আমাদের একদিন মরতে হবে জানিস তো?’

‘হ।’

‘জান্নাত,জাহান্নামের কথা কখনো কেউ বলেছে?’

প্রান্ত মাথা দুই পাশে নাড়াল। কেউ শোনায়নি। হেমলতা এমনটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রান্ত এ সম্পর্কে জানে না। তিনি ধৈর্য্য নিয়ে সুন্দর করে জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন। জান্নাতের বর্ণনা শুনে প্রান্তের চোখ

দু’টি জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রশ্ন করল হাজারটা। হেমলতাকে জানায়, সে জান্নাতে যেতে চায়। জাহান্নামে যেতে চায় না। হেমলতা বললেন, ‘আচ্ছা, এখন গল্পটা বলি। মন দিয়ে শুনবি।’

প্রান্ত মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিল। হেমলতা বলতে শুরু করেন, ‘একজন মহিলা একা থাকত বাড়িতে। না, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। খুব ছোট ছোট। খুব অভাব তাদের। ছোট একটা জায়গায় মাটির ঘর। ঘরের সামনে শখ করে একটা লাউ চারা লাগায়। লাউ গাছ বড় হয়। লাউ পাতা হয় অনেক। এই লাউ পাতা দিয়ে দিন চলে তার।

কখনো সিদ্ধ করে খায়। নুন, মরিচ পেলে শাক রেঁধে খায়। তো একদিন একজন ভিক্ষুক মহিলা আসল। ভিক্ষুক মহিলাটি খায় না দুই দিন ধরে। লাউ গাছে লাউ পাতা দেখে খেতে ইচ্ছে করে। লাউ গাছের মালিক যে মহিলাটি,তাকে ভিক্ষুক বলে, লাউ পাতা দিতে। রেঁধে খাবে। খুব অনুনয় করে বলে। মহিলাটির মায়া হয়। ভিক্ষুক মহিলাকে কথা শোনাতে শোনাতে কয়েকটা লাউ পাতা ছিঁড়ে দেয়। তার কয়দিন পর লাউ গাছের মালিক যিনি, তিনি মারা গেলেন। গ্রামবাসী সহ মসজিদের ইমাম মিলে দাফন করেন। বুঝছিস তো প্রান্ত?’

‘হ।’

প্রান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সে খুবই মনোযোগী শ্রোতা। হেমলতা বাকিটা শুরু করলেন, ‘গ্রামের ইমাম একদিন স্বপ্ন দেখেন, যে মহিলাটিকে তিনি দাফন করেছেন তার চারপাশে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তার গায়ে আঁচ অবধি লাগছে না। মহিলাটিকে ঘিরে রেখেছে লাউ পাতা। যার কারণে আগুন ছুঁতে পারছে না। ওইযে তিনি একজন ভিক্ষুককে নিজের একবেলা খাবারের লাউ পাতা দান করেছিলেন। সেই লাউপাতা তাকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাচ্ছে। জাহান্নাম থেকে

বাঁচতে আমাদের অনেক এবাদত করা উচিত। তার মধ্যে একটি হলো দান। সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা উচিত। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত না। বোঝা গেছে?’

‘হ, বুঝছি। আমি দান করাম।’

‘হুম। করবি। অনেক বড় হবি জীবনে। আর অনেক দান-খয়রাত করবি। আচ্ছা, প্রান্ত এখন যদি কোনো অভাবী এসে বলে, তোর লাউটা দিতে। তুই কী করবি?’

প্রান্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে। এরপর বলল, ‘দিয়া দিয়াম।’

‘একটু আগে একজন মহিলা আসছিল

না? দেখেছিস তো?’
‘হ, দেখছি।’
‘ সে খুব গরীব। বাড়িতে বাচ্চা আছে ছোট। এসে বলল, লাউ দিতে। তাই তোর লাউটা দিয়ে দিয়েছি। এজন্য কী এখন তোর মন খারাপ হবে?’
‘লাউডা তুমি দিছ। তাইলে তোমারে আগুন থাইকা বাঁচাইব লাউডা?’
‘লাউটা আমি দিলেও, তোর জন্য ছিল। তুই এখন খুশি মনে মেনে নিলে লাউটা তোকে আগুন থেকে বাঁচাবে।’
হেমলতার কথায় প্রান্ত খুশি হয় খুব। পরপরই মুখ গম্ভীর করে প্রশ্ন করল,
‘একটা লাউ কেমনে বাঁচাইব আমারে?’

প্রান্তর নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রশ্নটা শুনে হেমলতা, পদ্মজা, পূর্ণা হেসে উঠল। পদ্মজা বলল, ‘কয়টা পাতা অনেকগুলো হয়ে মহিলাটাকে বাঁচিয়েছিল। তেমন একটা লাউ অনেকগুলো হয়ে তোকে বাঁচাবে। ‘

প্রান্ত একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। হেমলতা হেসে হেসে তার উত্তর দিচ্ছেন। পদ্মজার হুট করেই প্রান্তের থেকে চোখ সরে হেমলতার উপর পড়ে। মা হাসলে সন্তানদের বুকে যে আনন্দের ঢেউ উঠে তা কী জানেন? পদ্মজার আদর্শ তার মা। সে তার মায়ের মতো হতে চায়।

_____

পাঁচদিন শেষ। শুটিং দলের মধ্যে খুব ব্যস্ততা। সবকিছু গুছানো হচ্ছে। পাঁচ দিনে তাড়াহুড়ো করে শুট শেষ করা হয়েছে। লিখন উঠানে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। চিত্রা এসে তার পাশে বসল। কাশির মতো শব্দ করল লিখনের মনোযোগ পেতে। লিখন তাকাল। ম্লানমুখে প্রশ্ন করল, ‘ সব গুছানো শেষ? ‘
‘হুম, শেষ। তুমি তো কিছুই গুছাওনি।’
‘বিকেলে রওনা দেব। আমার আর কি আছে গুছানোর? দুপুরেই শেষ করে

ফেলব।’

‘মন খারাপ?’

লিখন কিছু বলল না। লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে শূন্যতা। কিছু ফেলে যাওয়ার বেদনা। বুকের বাঁ পাশে চিনচিন করা ব্যাথা। চিত্রা হাত ঘড়ি পরতে পরতে বলল, ‘ছোট বোনের সমান বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছিলে। এখন তার প্রেমেই পড়লে।’

লিখন কিছু বলল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। চিত্রা বলল, ‘পদ্মজা কিন্তু অনেক বড়ই। আগামী মাসে ওর সতেরো হবে শুনেছি। এই গ্রামে সতেরো বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে

হাতেগোনা কয়টা। পদ্মজার শ্রেণীর বেশিরভাগ মেয়ে বিবাহিত। আর খুব কম মেয়ে পড়ে।’
চিত্রার কথা অগ্রাহ্য করে লিখন বলল, ‘তোমার বিয়েটা কবে হচ্ছে?’
‘বছরের শেষ দিকে। সব ঠিকঠাক থাকলে। আর ভগবান চাইলে।’

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঢাকা রওনা দেবে। হেমলতা, মোর্শেদ বিদায় দিতে এসেছেন। দলটার তিন-চার জনের চরিত্রে সমস্যা থাকলেও বাকিরা খুব ভাল। হেমলতার সাথে মিশেছে খুব। নিজের বাড়ি মনে করে থেকেছে। বাড়ির দেখাশোনা করেছে। লিখন

হেমলতার আড়ালে একটি সাহসিকতার কাজ করে ফেলল। ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে আসল। বারান্দায় বসেছিল পদ্মজা। লিখনকে দেখে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। পদ্মজাকে কিছু বলতে দিল না লিখন। সে দ্রুত বারান্দায় উঠে পদ্মজার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে জায়গা ত্যাগ করল। পদ্মজা অনবরত কাঁপতে থাকে। পূর্ণা চৌকি থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সে হতভম্ব। ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। হাত থেকে চিঠি পড়ে যায়। পূর্ণা কুড়িয়ে নিল। পদ্মজার গলা শুকিয়ে কাঠ।

হেমলতা এসে দেখেন পদ্মজা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। কেমন দেখাচ্ছে যেন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেব, ‘ পদ্ম? শরীর খারাপ?’

মায়ের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ভয় পেল। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্থি। চোখ দু’টি স্থির রাখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস এলোমেলো। পূর্ণা পরিস্থিতি সামলাতে বলল, ‘আম্মা, আপার মাথা ব্যথা।’

‘হুট করে এমন মাথা ব্যথা উঠল কেন? পদ্মরে খুব ব্যথা?’

পদ্মজা অসহায় চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। আকস্মিক ঘটনায় সে ভেঙে পড়েছে। ডান হাত অনবরত কাঁপছে।

হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে দু’মেয়েকে দেখেন। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, ‘কি লুকোচ্ছিস দুজন? কেউ এসেছিল?’

মায়ের প্রশ্নে পদ্মজার চেয়ে পূর্ণা বেশি ভয় পেল। হাতের চিঠিটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল। কি লিখা আছে না পড়ে, এই চিঠি হাতছাড়া করবে না সে।

চলবে....